হিন্দু সংহতি

# সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৯, কলকাতা ✿ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

"১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট যারা পাকিস্তান দাবীর সমর্থক ছিল, ১৫ই আগষ্ট তারা কিভাবে ভারতভক্ত হয়ে যাবে?"

—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

### মেটিয়াবুরুজে স্কুল ছাত্রীর ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে

## ড্রাইভার বিনোদ গুলিবিদ্ধ

এরা রোমিও নয়, এরা ইভ্‌টিজার নয়। এরা সংখ্যালঘু তোষণের বলে বলীয়ান হিন্দু নারী শিকারী। গত ১৮ আগষ্ট কলকাতার রাস্তায় মেটিয়াবুরুজে ঐ সংখ্যালঘু কিশোরেরা স্কুল গাড়ীর (সুমো) সামনে তাদের মোটরবাইক দাঁড় করিয়ে দিয়ে গাড়ীকে থামাল। তারপর ড্রাইভার বিনোদ জয়সোয়ালের বুকে সোজা গুলি চালায় এবং নির্বিঘ্নে চলে যায়। বিনোদের অপরাধ—ঐ তিনটি ছেলে বাইকে চেপে স্কুল গাড়ীর পাশে পাশে যেতে যেতে তাকে গাড়ী থামাতে বলে—তারা একটি ছাত্রীকে তাদের বাইকে তুলবে। তারা বাইকে চলতে চলতেই ছাত্রীদেরকে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী করে ডাকছিল। মেয়েরা ভয়ে কাঁপছিল। ড্রাইভার বিনোদ সুমো চালাতে চালাতেই এই নোংরামির প্রতিবাদ করছিল, এবং সে গাড়ী থামায় নি। এই তার অপরাধ। ঐ ছেলেরা তাকে বলেছিল, 'চল মেটিয়াবুরুজে, তোকে দেখে নেব।' তারা কথা রেখেছে। সুমো মেটিয়াবুরুজে পৌঁছতেই গাড়ীর সামনে বাইক দাঁড় করিয়ে গাড়ীটা থামিয়ে দিয়ে সোজা বিনোদের বুকে গুলি। গাড়ীর মধ্যে বসে মনোরমা, প্রিয়ঙ্কা, সাধনারা কাঁদছিল। ড্রাইভার বিনোদকে তারা সুমো আঙ্কল বলে ডাকত। রক্তাক্ত হয়ে তাদের সুমো আঙ্কল রাস্তায় পড়ে যেতে তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ১০ মিনিট হেঁটে স্কুলে পৌঁছাল।

সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে জানা যায়, এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, স্কুল যাওয়ার পথে ছাত্রীদের বিরক্ত করা এ এলাকার নিত্য ঘটনা। এ এলাকা মানে মেটিয়াবুরুজ খিদিরপুর এলাকা। পুলিশ? তারা সম্পূর্ণরূপে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলেছে। গার্ডেনরিচ থানা কলকাতা পুলিশের এলাকায়। পাশেই মেটিয়াবুরুজ থানা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পুলিশের আওতায়। ওই দুটি থানাই মহান সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা। সেখানে হিন্দু মেয়েরা নিত্য লাঞ্ছনা অবমাননা অমর্যাদার শিকার হয়। তারা যে কি অবস্থায় রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে—তা স্থানীয়রা খুব ভালভাবেই জানে। কিন্তু তারা জানায় না। কারণ সেকুলারিজমে ওটা নিষেধ। আর পুলিশ! তাদেরকেও তো সেকুলারিজম্ পালন করতে হবে। সুতরাং, অপরাধী, হত্যাকারী, ধর্ষণকারী যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হয়, তাহলে চোখ বুজে থাকতে হবে। ওই অপরাধীদের ধরার চেষ্টা করলে সেকুলারিজম ব্যাহত হবে। এবং সেটা নিরাপদও নয়। সেটা বিনোদ মেহেতা প্রাণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

এই আই.পি.এস. অফিসার বিনোদ মেহেতা ছিলেন কলকাতা পুলিশের ডি.সি., পোর্ট, অর্থাৎ পোর্ট বা বন্দর এলাকার ডেপুটি কমিশনার। বোধহয় তিনি ততটা সেকুলার ছিলেন না। তাই অপরাধীদের ধর্ম না দেখে তাদের পিছনে ধাওয়া করে ঐ গার্ডেনরিচ এলাকায় ঢুকে পড়েছিলেন। সেটা ১৯৮৪ সাল। তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তাঁর গলার নলি কাটা হয়েছিল, তাঁর লিঙ্গ কেটে নেওয়া হয়েছিল। তাঁর ঐ ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে কলকাতা পুলিশের সমস্ত অফিসারেরা শিক্ষা পেয়েছিল যে অপরাধী ধরার আগে তার ধর্ম দেখতে হবে। অপরাধী সংখ্যালঘু হলে তাকে ধরা চলবে না। এটাই সেকুলারিজম্। এই সেকুলারিজম্ না মানলে ডি.সি. পোর্ট বিনোদ মেহেতার মত পরিণতি হবে।

সুতরাং, গত ১৮ আগষ্ট মেটিয়াবুরুজের ঐ

*শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়*

### উলুবেড়িয়াতে জমি দখলের অপচেষ্টাকে

## রুখে দিল হিন্দুরা

হাওড়া জেলায় নোরিট গ্রামের পর এবার বাড়বেড়িয়া গ্রাম। উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকে হাটগাছা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাড়বেড়িয়া গ্রামে রাস্তার ধারে তুলসি দাসের ৭০ ফুট জায়গা গত ৩০-৩২ বছর তার দখলে আছে। তুলসি দাস বৃদ্ধ, তার তিন ছেলে চাকরি সূত্রে বাইরে থাকে। এক ছেলে গ্রামে থাকে। সে নিরীহ প্রকৃতির। বাড়বেড়িয়া মধ্যপাড়ার কিছু মুসলিম পরিকল্পনা করে সন্ত্রাস সৃষ্টি ক'রে তুলসি দাসের ঐ ৭০ ফুট জায়গা দখল করে মসজিদ তৈরী করবে।

গত ৪ জুলাই মধ্যপাড়ার মুসলিমরা অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে দল বেঁধে এসে প্রকাশ্যে তুলসি দাসের ঐ জায়গার বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে জমিতে নামে, বহু পুরনো ও দামী গাছপালা কেটে নেয়, ঐ জায়গার দখল নেয়। তুলসি দাসের ছেলে, দু'জন হিন্দু প্রতিবাদ করতে গেলে মুসলিমরা তাদেরকে প্রচন্ড মারধোর করে ও অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। ঐ গ্রামের হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হলেও ভয়ে এগোতে পারে না। পরে হিন্দুরা গণস্বাক্ষর সহ দুস্কৃতিদের নামে অভিযোগ স্থানীয় পঞ্চায়েত ও উলুবেড়িয়া থানায় জমা দেয়। কিন্তু থানা কোন পদক্ষেপ নেয় না। হামলাকারী দুস্কৃতিরা হল ঃ লাহাবউদ্দিন খান, পিতা ইশা খান; খোকন মোল্লা, পিতা-আজাহার মোল্লা; জাকির মন্ডল, পিতা ইয়ার মন্ডল; সোউরাব মন্ডল, পিতা আনকন মন্ডল এবং আরও প্রায় ৪০-৪৫ জন।

উক্ত ঘটনার নেপথ্যে যে দুটি মুসলিম মস্তিষ্ক কাজ করেছিল তাদের মধ্যে একজন সরকারী চাকুরীজীবি যার প্রধান কাজই হল সম্প্রদায়িক উস্কানি ছড়িয়ে হিন্দুদের জব্দ করা। কেবলমাত্র এই কাজ নয়, এই অঞ্চলের সমস্ত দুষ্কৃতিমূলক কাজের মুল শিকড় ঐ সরকারী চাকুরীজীবি। কিছু সুস্থ সংস্কৃতি সম্পন্ন মুসলমান মানুষ ঐ ব্যাক্তির বিরুদ্ধে পরোক্ষ প্রতিবাদ জানায়।

আরেকজন একটি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় পঞ্চায়েত সদস্য, যে হিন্দুদের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ ভোট পেয়ে পঞ্চায়েতে জিতেই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ খুলে নখ দাঁত বের করে হিন্দুদের সর্বনাশ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কারণ সে জানে যে এই হাওড়া জেলায় এখন তাদের পার্টির উপরের তলার নেতারা ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা 'আমাদেরই ধর্মের লোক। সুতরাং হিন্দু জব্দ করার সুবর্ণ সুযোগ এসে গিয়েছে'।

পুলিশ প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলির নীরবতায় দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভে ফুঁসতে থাকা হিন্দুদের এবার সঙ্ঘবদ্ধ করে প্রতিকারের পথে নামল কিছু যুবক। দলমত নির্বিশেষে পালপাড়া ও আশপাশের হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ঐ বাগানটিতে ইটের প্রাচীর দিয়ে মুসলিম দখলমুক্ত করে। অবশ্য সেটি করতে গিয়ে তাদের মুসলিম বোমাবাজির শিকার হতে হয়। অনেক পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলেও মুসলিম বোমাবাজেরা বহাল তবিয়তেই ঘুরে বেড়াতে থাকে। কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। তা সত্ত্বেও হিন্দুরা তাদের সাহস ও শক্তির পরিচয় রাখায় মুসলিমরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। বর্তমানে ওরা হিন্দুদের খুন করার হুমকি দিয়েই চলেছে। কিন্তু মুসলিম আক্রমণের সময় দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে ঢুকে পড়লেই যে বাঁচা যাবে না এ সত্য আজ হিন্দুরা বুঝেছে। তারা বুঝেছে পুলিশ প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের সাহায্য না পেলেও হিন্দুই কেবল বাঁচাতে পারে হিন্দুদের। 'মুসলিম অত্যাচার আর নীরবে সহ্য করা নয়, ঘরে ঢুকে পড়াও নয়'—বর্তমানে পালপাড়া ও আশপাশের হিন্দুদের এই একটি মাত্র স্লোগান।

### দুর্গাপূজার অভিনন্দন

না, শারদোৎসব নয়, দুর্গোৎসব। বসন্তোৎসবের মত এটা কোন ঋতুবিশেষের উৎসব নয়। দুর্গোৎসবকে শারদোৎসব বলা সেকুলার বিকৃতি, হিন্দু ধর্মকে ভুলিয়ে দেওয়া ও গুলিয়ে দেওয়ার সেকুলারী অপচেষ্টা।

**অসুরদলনী দেবী দুর্গার আগমন উপলক্ষে সকল পাঠককে জানাই পূজা অভিনন্দন।**

## মুর্শিদাবাদ ছাত্রী হোস্টেলে যৌন অত্যাচারে প্রতিমা বাস্কের মৃত্যু, হোস্টেল খালি

সারা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যব্যাপী আদিবাসী ও তপশিলী মেয়েরা বিধর্মীদের যৌন লালসার শিকার হচ্ছে। গত ২৫ আগষ্ট রাত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার ইটোর গ্রামে আদিবাসী শিক্ষানিকেতনের ছাত্রীনিবাসে দুস্কৃতিরা হামলা চালায় ও মেয়েদের উপর যৌন অত্যাচার করে। অত্যাচারের ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে ঐ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অনেক ছাত্রী অজ্ঞান হয়ে যায়। দুস্কৃতিরা নির্বিঘ্নে চলে যায়। তারপর আশপাশের গ্রামবাসীরা ছুটে এসে অসুস্থ ছাত্রীদের সেবা শুশ্রুষা শুরু করে। কিন্তু পাঁচজন ছাত্রীর অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় তাদেরকে নবগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করতে হয়। নিয়ে যাওয়ার পথেই নবম শ্রেণীর ছাত্রী প্রতিমা বাস্কের-র মৃত্যু হয়। অন্য চারজন আহত ছাত্রীকে বহরমপুর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। এই ছাত্রীরা হল পিঙ্কি মন্ডল-নবম শ্রেণী, দীপালি মন্ডল ও বুল্টি মুরারী- ষষ্ঠ শ্রেণী এবং সবিতা সোরেন- সপ্তম শ্রেণী। ২৭ আগস্ট বিকালে হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায় যে, ঐ চারজন ছাত্রীর স্যালাইন ও অক্সিজেন চলছে এবং তারা হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ওদের বিছানার পাশে দুজন মহিলা পুলিশ মোতায়েন আছে যাতে তারা স্বাধীনভাবে ঘটনার বিবরণ না দিতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ৫০জন তপশিলী ও আদিবাসী ছাত্রীদের এই হোস্টেলটি ইটোর মুসলিম পাড়ার পাশেই অবস্থিত। এরকম ঘটনা এর পূর্বেও এখানে ঘটেছে এবং প্রত্যেকবারই ঘটনাকে চাপা দেওয়া হয়েছে। এবার একজন ছাত্রী মারা যাওয়ায় ঘটনাটি চাপা দেওয়া যায় নি। বার বার এইরকম ঘটনা ঘটায় বিক্ষুব্ধ স্থানীয় হিন্দুদের ক্ষোভকে দমন করতে এলাকায় বিশাল পুলিশ ও র‍্যাফ নামানো হয়েছে। প্রশাসন

*শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়*

আমাদের কথা

# রাজ্যটা যাদের হাতে তুলে দিয়েছে সিপিএম

এই কাগজ যখন পাঠকের হাতে গিয়ে পড়বে তখন দুর্গাপূজা এসে গিয়েছে। বাঙালির কর্মসূচী তখন একটাই। আনন্দ করতে হবে। সেখানে যেন ফাঁক না যায়। তখন কতজন বাঙালির একথা ভাবার অবসর হবে যে, আমাদের রাজ্যটা কাদের হাতে চলে গিয়েছে। রোজ খবরের কাগজে গফ্‌ফর, কেলোবাবু, বিপ্লব বিশ্বাসদের নাম দেখছি। কেলোবাবু মানে আব্দুল হাই মৌল্লা। বেদিক ভিলেজ আমাদের পবিত্র বেদের নামের কালি ছিটিয়ে দিল। ধিক্কার জানাই কমল গান্ধী, রাজকিশোর মোদীর মত ওইসব চরম অসাধু ব্যবসায়ীদের যারা নিজেরা হিন্দু হয়েও হিন্দুধর্মের পবিত্র বেদ নামকেও নোংরা ব্যবসার কাজে লাগাতে দ্বিধা করে না। এই ব্যবসায়ীগুলো চরম অসাধু, চরম নোংরা।

রাজারহাটের ওই বেদিক ভিলেজ (প্রমোদ কুঞ্জ) কত নিরীহ গ্রামবাসীর জমি বন্দুকের ডগায় কেড়ে নিয়ে তৈরী হয়েছে তা আজ সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যাচ্ছে। ওই গ্রামবাসীদের কান্না আজ সবাই জানতে পারছে। কিন্তু আজ থেকে ১৫ বছর আগে থেকে যখন রাজারহাট এলাকায় ওই জমি কাড়া চলছিল, সামাজিক সংগঠনের কর্মী হওয়ার সুবাদে তখনই আমরা সে খবর পেয়েছিলাম। গ্রামবাসীদের কান্নার আওয়াজ তখনই আমাদের কাছে পৌঁছেছিল। কিন্তু আমরা তখন কিছুই করতে পারিনি, তার দুটি কারণ। প্রথম, তখন আমরা যে সব সংগঠনগুলির সদস্য ছিলাম, সেই সংগঠনগুলির এই ভয়ংকর দানবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ইচ্ছা বা সাহস কোনটাই ছিল না। ফলে আমরা কোন চ্যালেঞ্জ না নিয়ে রুটিন কর্মসূচীতে ব্যস্ত থাকতাম। এবং রুটিন কর্মসূচীকে এতটাই গ্লোরিফাই করে দেখানো হত যে এইসব ভয়ংকর অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিছু করতে না পারার জন্য কোন অপরাধবোধ বা দায়িত্ববোধ সংগঠনের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে তৈরী হত না। এখনও হয় না।

দ্বিতীয় কারণ, সি পি এম তো জমির পয়সা খেয়েছেই। অন্য সব রাজনৈতিক দলগুলিকেও, হ্যাঁ সব, একটাও বাদ নয়, এই পাপের অংশীদার করে নিয়েছিল। ফলে ঐ নিপীড়িত সর্বস্ব লুণ্ঠিত মানুষগুলির জন্য ঐ এলাকায় কোন প্রতিবাদ সংগঠিত করা যাচ্ছিল না। আর এলাকার বাইরে ঐ অত্যাচারের খবর প্রকাশিত হচ্ছিল না। কারণ ঐ গফ্‌ফরদের পাপের রোজগারের ভাগ আনন্দবাজার এবং অন্য পত্রিকা ও মিডিয়াগুলিও পাচ্ছিল। আজ যখন বেদিক ভিলেজ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, আর ঐ পাপকে চাপা দেওয়া গেল না, তখন আনন্দবাজার বর্তমানেরা তেড়েফুড়ে লাগল, যেন ওরা এতদিন কিছুই জানত না। এইসব ফূর্তি করার জায়গাগুলোতে বড়লোকেরা পয়সা দিয়ে ফূর্তি করতে যায়। আর নেতা, মন্ত্রী, সরকারি অফিসার, পুলিশ অফিসার, আর তার সঙ্গে সাংবাদিকদেরকেও ওখানে ফূর্তি করতে দেওয়া হয় বিনা পয়সায়। এই কাগজগুলোর আর টিভি চ্যানেলগুলোর জেলা প্রতিনিধিরা জানত না গ্রামবাসীদের জমি কেড়ে নেওয়ার কথা? সুতরাং এই গফ্‌ফর, আব্দুল হাই মোল্লাদের এই অপকীর্তির পৃষ্ঠপোষক রেজ্জাক মোল্লা, গৌতম দেব, আরাবুল ইসলামদের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দবাজার, বর্তমান, আজকালও।

সিপি এমের দলীয় স্বার্থসিদ্ধিতে গফ্‌ফরদের ব্যবহার করা এই প্রথম নয়। পাঠকের মনে পড়ে ১৯৯৩ সালে কলকাতার বৌবাজারে রশিদ খানের কথা? বাবরি মসজিদ ভাঙার বদলা নেওয়ার জন্য লালবাজারের নাকের ডগায় যে নিজের বাড়ীতে শক্তিশালী বোমার বিশাল মজুদ তৈরী করেছিল! ১২-ই মার্চ (১৯৯৩) মুম্বাই বিস্ফোরণের পর ১৬-ই মার্চ রশিদ খানের বাড়ীতে ঐ বোমাগুলি ফেটে গিয়ে ৯৪ জন লোক নিহত হল। রশিদ খান গ্রেফতার হল। তার ডায়েরী থেকে সিপিএম নেতা বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক লক্ষ্মী দে ও মহিলা নেত্রী শ্যামলী গুপ্তর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানা গেল। জানা গেল রশিদ খানের এসি রেস্টুরেন্ট ও হোটেলে সেবা নিতে বামফ্রন্টের অনেক নেতা ও পুলিশ অফিসারের আগমন হত। বোঝা গেল মধ্য কলকাতায় সিপি এমের শক্তির উৎস কী! কোন শক্তির জোরে কলকাতার কলেজ, ইউনিভার্সিটি ও অফিসগুলিতে লাল ঝান্ডা ওড়ে! ঠিক এরকমই অবদান মগরাহাটের সেলিমের। সি পি এম আশ্রিত এই সেলিমের অত্যাচারে মগরাহাট ব্লকে (১ও ২) ১৯৮১ সাল থেকে ২০০১ সালের মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যা ৮৭ শতাংশ থেকে কমে ৪৭ শতাংশ হয়ে গেল। তবু কারও টনক নড়ল না। আনন্দবাজারেরও নয়। কারণ সব গফ্‌ফর সেলিমেরাই কোন না কোন ভাবে দাউদ ইব্রাহিম ও আই এস আই-এর সঙ্গে যুক্ত। আর কোন না কোন পথে দাউদ ইব্রাহিম ও আই এস আই-এর পয়সা আনন্দবাজারের ঘরে ও তার সাংবাদিকদের পকেটে আসে। তাই গোটা রাজ্যব্যাপী অসংখ্য গফ্‌ফর, আব্দুল, সেলিম, রশিদদের হাতে সাধারণ মানুষের এই অবর্ণনীয় অত্যাচারের কাহিনীকে চাপা দিয়ে রাখার অর্ডারী কাজ করে চলেছে আনন্দবাজারেরা।

সি পি এম আগে এরকম ছিল না। হিংসায় তারা বরাবরই বিশ্বাসী। কিন্তু প্রমোদ দাশগুপ্ত-হরেকৃষ্ণ কোঙারেরা গণহিংসায় বিশ্বাস রাখতেন (উদাঃ-সাঁইবাড়ি হত্যাকান্ড), গুপ্ত হিংসায় নয়। কিন্তু সি পি এম ক্ষমতায় আসার পর ও প্রমোদবাবুদের জমানা শেষ হওয়ার পর জ্যোতি-সুভাষ-অনিল-বিমানের সি পি এম মেহনতী মানুষদের বদলে সমাজবিরোধীদের উপরই বেশী নির্ভর করতে লাগল। বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে এদের হাতিয়ার হয়ে উঠল রশিদ-সেলিম-গফ্‌ফর-রফিকেরা। তারপর অন্য দলগুলোও এই মডেল অনুসরণ করতে লাগল। তারপর গুরুমারা বিদ্যায় আরও বেশী দক্ষ হয়ে উঠল তৃণমূল কংগ্রেস। নন্দীগ্রামে তারা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলল। এইভাবে গোটা রাজ্যটা চলে গেল ওই গফ্‌ফরদের হাতে। মগরাহাট রাজারহাট নিউটাউনের গ্রামবাসীদের দীর্ঘশ্বাসে সি পি এমের তো পতন ঘটবে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটা বাঁচবে কি?

*প্রথম পাতার শেষাংশ*

## মেটিয়াবুরুজে স্কুল ছাত্রীর .....

নারী নির্যাতন ও গুলি চালানোর ঘটনায় পুলিশ কিছু করবে না। যে হিন্দুরা নিজের বাড়ীর মেয়েদের সম্ভ্রম নিয়ে চিন্তিত, তারা নিরাপদ স্থান (মানে হিন্দুপ্রধান এলাকা) দেখে সরে যাবে। মেটিয়াবুরুজ, গার্ডেনরিচের এলাকা বাড়তে বাড়তে পার্ক সার্কাস, মল্লিকবাজার, রাজাবাজার, বেলগাছিয়া সব একসঙ্গে জুড়ে যাবে। তারপর? তারপর কি, সবাই জানেন। কিন্তু চুপ্, চুপ্। বলতে নেই। সেকুলারিজম্ আছে না!

প্রসঙ্গতঃ, জানানো দরকার যে, ছাত্রীদের নিশানা করা, কিশোরী যুবতী মেয়েদের দিকে হাত বাড়ানো --- মেটিয়াবুরুজ থেকে চেতলা, রাসবিহারী মোড় এবং হাজরার যোগমায়া দেবী কলেজ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে।

# এ দেশটা কি একটা পরিবারের পৈতৃক সম্পত্তি?

ধিক্ আমাদের। ধিক্ আমাদের দেশবাসীকে। ধিক্ আমাদের নেতাদের, জনপ্রতিনিধিদের। এদেশে কোন সরকারী প্রকল্প স্বামী বিবেকানন্দের নামে নেই। ছত্রপতি শিবাজীর নামে নেই, নেই রামদাসের নামে, রামতীর্থের নামে, রামকৃষ্ণের নামে; নেই চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্তের নামে, নেই আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, জগদীশচন্দ্র, রামন, বিক্রম সারাভাই, ভাবা-র নামে; নেই তিলক, মালব্য, গোখলে, প্যাটেল, ভগৎ সিং, রাজগুরু, নেতাজী, রাসবিহারী, নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপী, লক্ষ্মীবাই, নেতাজীর নামে। এদেশের সমস্ত সরকারী প্রকল্প, যোজনা,বন্দর, বিমানবন্দর, খেলার স্টেড়িয়াম, ট্রফি, টুর্নামেন্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু রাজীব গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী ও জহরলাল নেহেরুর নামে। এমনকি মহাত্মা গান্ধীর নামেও নেই। আর এসব আমরা মেনে নিচ্ছি। আমাদের মহান পূর্বপুরুষদের, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদদের সব অবদান আমরা অস্বীকার করছি। এতবড় অকৃতজ্ঞ আমরা।

এথেকে মনে হয় যে শিবাজী, রাণাপ্রতাপ, সূর্যসেন, বাঘাতীনের বংশধর আমরা নই, সেই যারা মোগল আমলে বলেছিল 'দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরো বা'—আমরা তাদেরই বংশধর। দিল্লীতে যারা ক্ষমতায় বসে থাকবে, তাদেরকেই ভগবান বলে মেনে নেওয়া, তাদেরকে কুর্নিশ ঠোকাই যেন আমাদের পরম্পরা। তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির নেহেরু পরিবারের এই স্তাবকতা, দেশের এই অপমান আমরা মেনে নিচ্ছি। আচ্ছা, আমাদের সমস্ত ভারতবাসীর নামের পিছনে উপাধিগুলি পাল্টে শুধু গান্ধী আর নেহেরু করে দিলে কেমন হয়? ঘোষ, বোস, মিত্র, দাস, মন্ডল, বিশ্বাস, চ্যাটার্জ্জী, ব্যানার্জী—সব বাদ দিয়ে শুধু গান্ধী আর নেহেরু! তাহলে আর এই আত্ম অবমাননা থাকে না। নিজের পূর্বপুরুষদের ভুলে গিয়ে আমরা সবাই গান্ধী-নেহেরুর বংশধর।

ইন্টারনেটে প্রচারিত তথ্য থেকে জানা যায়, বর্তমানে ভারতে কেন্দ্র সরকার দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রীয় স্তরে ১১টি যোজনা, বিভিন্ন রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত রাজ্য স্তরে ৫২টি যোজনা, ৫টি বন্দর ও বিমানবন্দর, ১৯টি স্টেডিয়াম, ১০টি ইউনিভার্সিটি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৮টি ট্রফি ও টুর্নামেন্ট, বিভিন্ন বিষয়ে ১৭টি অ্যাওয়ার্ড বা পুরস্কার, ৯টি স্কলারশিপ/ফেলোশিপ, ১২টি মিউজিয়াম/জাতীয় পার্ক, ১০টি হাসপাতাল, ৬টি ইন্‌স্টিটিউট/চেয়ার, শুধু দিল্লীতে ৭৪টি সরকারী ভবন, চৌক (মোড়), পার্ক ও এলাকা শুধু রাজীব গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী ও জহরলাল নেহেরু নামে আছে। এটা কি আমাদের আমাদের চরম অপমান নয়? এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান কি শুধু নেহেরু পরিবারের টাকায় তৈর হয়েছে? এগুলো কি সোনিয়া গান্ধীর শ্বশুরের টাকায় চল্‌ছে? তাহলে অন্য কোনো মহাপুরুষের নাম নেই কেন? কংগ্রেসী ও তৃণমূলী নেহেরু পরিবারের ক্রীতদাসরা এর জবাব দেবেন কি? কিছু যোজনা/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ ইন্দিরা আবাস যোজনা, জহরলাল নেহেরু রোজগার যোজনা, ইন্দিরা গান্ধী ক্যানাল প্রজেক্ট, ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনশন স্কীম, রাজীব গান্ধী উদ্যমী মিত্র যোজনা, রা. গা. গ্রামীন বিদ্যুতীকরণ যোজনা, রা. গা. ন্যাশনাল ড্রিঙ্কিং ওয়াটার মিশন, জ. নেহরু আরবান রিনিউয়াল মিশন, ইন্দিরা গান্ধী স্পোর্টস্ কমপ্লেক্স, ই. গা. ইন্ডোর স্টেডিয়াম, জ. নে. স্টেডিয়াম, রা. গা. স্পোর্টস্ স্টেডিয়াম, রা. গা. ন্যাশনাল ফুটবল অ্যাকাডেমী, রা. গা. ফেলোশিপ-ইগনু, রা. গা. সায়েন্স ট্যালেন্ট রিসার্চ ফেলোজ, রা. গা. ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারী, ই. গা. জুলজিক্যাল পার্ক (দিল্লী), রা. গা. হেলথ মিউজিয়াম, রাজীব চৌক, ইন্দিরা চৌক, নেহেরু প্লেস, এরকম অসংখ্য । আর সর্বশেষ যোজনা-হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরী মুম্বাইতে হাজার কোটি টাকার 'রাজীব গান্ধী বান্দ্রা ওয়ারলি সী লিঙ্ক'-সৌজন্য নেহেরু পরিবারের চাপলুস্ অশোক চৌহান ও শরদ পাওয়ার। আমাদের লজ্জা রাখার আর কোন জায়গা আছে কি?

# একরক্ষী গ্রাম হিন্দুশূন্য হয়ে গেল

মুর্শিদাবাদ জেলাতেই সাগরদীঘি থানার ঠাকুরপাড়া একরক্ষী গ্রামে মাত্র ৪০ ঘর আদিবাসী বসবাস করত। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কয়েক জন মুসলিম দুস্কৃতি দুটি আদিবাসী মেয়েকে ধর্ষণ করে। গ্রামবাসীরা ঐ দুষ্কৃতিকারীদের মধ্যে দুজনকে ধরে ফেলে ও গণ পিটুনি দেয়। তাতে মতি শেখ নামে একজন ধর্ষণকারীর মৃত্যু হয়। তারপর ঐ গ্রামে শুরু হয় পুলিশী অত্যাচার ও মুসলিমদের হুমকি। পরিণাম—ঐ ৪০ ঘর আদিবাসী গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এই ছোট্ট গ্রামটি আজ হিন্দুশূন্য হয়ে গেল। এই ভাবে গোটা রাজ্যে মুসলিমবহুল এলাকা থেকে হিন্দু মাইগ্রেশন বা হিন্দু পলায়ন ঘটছে। পাকিস্তান তৈরী হতে আর কত দিন?

*প্রথম পাতার শেষাংশ*

## মুর্শিদাবাদ ছাত্রী হোস্টেলে.....

এবং কিছু রাজনৈতিক দালাল ঘটনাটিকে ভূতের ভয়জনিত মৃত্যু বলে ধামাচাপা দিতে চাইছে। কিন্তু সকলেই বোঝে শুধু আতঙ্কে একজনের মৃত্যু ও চারজনকে স্যালাইন-অক্সিজেন দিতে হয় না।

২০০১ সালের জনগণনাতেই নবগ্রাম ব্লকে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে গিয়েছে। মুসলিমরা এই ব্লকে ঐ সময়েই ৫১ শতাংশ ছিল। বর্তমানে তো ৫৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট ২৬ টি ব্লকের মধ্যে ২৫টিতেই হিন্দুরা সংখ্যালঘু। গত জুলাইয়ে বেলডাঙ্গা মহকুমার নওদা থানায় ঝাউবোনার হাইস্কুলে নমাজ পড়াকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের এতবড় ঘটনা ঘটে গেল। সমগ্র জেলা ব্যাপী এরকম বহু ঘটনা ঘটছে। যে কেউ চোখ কান খোলা রাখলে বুঝতে পারবেন যে মুর্শিদাবাদের ৩৩ শতাংশ হিন্দু ৬৭ শতাংশ মুসলিমের দয়ায় বেঁচে আছে। অর্থাৎ হিন্দুরা এখানে মুসলমানদের জিম্মি হয়ে আছে। এই নবগ্রাম থেকেই আজকের সাংসদ অধীর চৌধুরীর রাজনৈতিক উত্থান হয়েছে। সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়েছে যে নবগ্রামের ওই হোস্টেল খালি করে সমস্ত ছাত্রী চলে গিয়েছে। পড়াশোনার থেকেও ইজ্জত রক্ষাটা তাদের কাছে বেশী দামী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সাংসদ অধীর চৌধুরী আদিবাসী ও তপশিলী ছাত্রীদের ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারবেন না।

# জিন্না যশোবন্ত বিজেপি পাকিস্তান

**তপন কুমার ঘোষ**

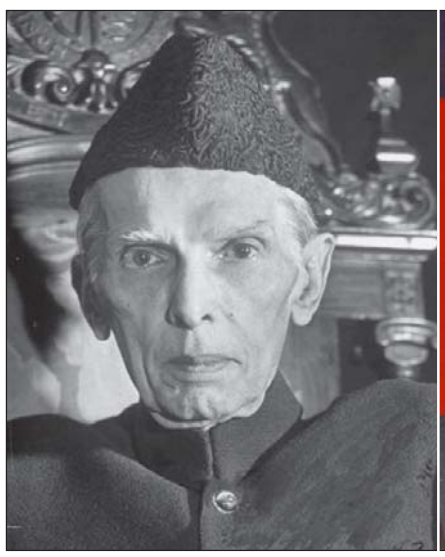

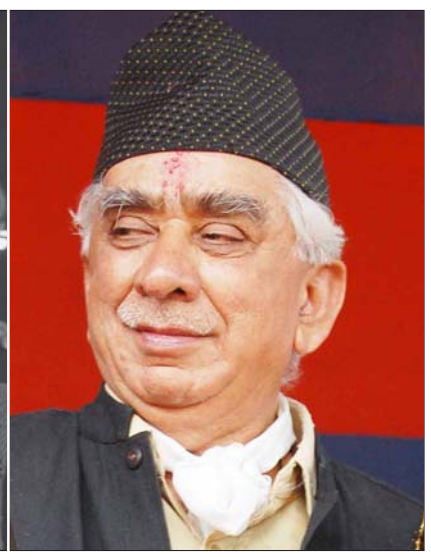

বিজেপি নেতা, ভারতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যশোবন্ত সিং, জয়চাঁদ-মানসিং-এর বংশধর, বই লিখলেন, নাম "জিন্না ঃ ইন্ডিয়া-পার্টিশন-ইন্ডিপেন্ডন্স"। ৫৯৩ পাতার এই বইয়ের মূল বক্তব্য হল-'জিন্না ভারত বিভাগের জন্য দায়ী নয়। জিন্না কাঠমোল্লা ছিল না, সে শুয়োর খেত, নমাজ পড়ত না, লুঙ্গি পরত না, উর্দু জানত না। সুতরাং সে সেকুলার ছিল। ভারত বিভাগের জন্য প্রধান দায়ী নেহেরু ও প্যাটেল, এবং অনেকটা গান্ধী।' বইটা ঘটা করে উদ্বোধন হল। প্যাটেলকে দায়ী করায় বিজেপি ও সংঘ পরিবারের লোকেরা খেপে গেল। নেহেরু গান্ধীকে দোষী সাব্যস্ত করায় কংগ্রেস ক্রুদ্ধ। পরপর দুবার লোকসভা নির্বাচনে হেরে গিয়ে বিজেপি-তে চলছিল পরস্পরকে দোষারাপের পালা। পরাজয়ের জন্য অভিযোগের কাঠগড়ায় যারা দাঁড়িয়েছিল, অথাৎ বিজেপি-র বর্তমান নেতৃত্ব আদবানি, রাজনাথ, অরুণ জেটলি, (মনে রাখতে হবে এরাই নির্বাচন পরিচালনা করেছিলেন, এবং তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন)— এরা পেয়ে গেলেন সুবর্ণ সুযোগ। লাগাতার পরাজয়ের ব্যর্থতা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে এক কোপে পাঁঠা কাটা। কোন শো-কজ পর্যন্ত না করে যশোবন্ত সিংকে দল থেকে একেবারে বহিস্কার। যশোবন্ত ভারতে হলেন বলির পাঁঠা। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানে হয়ে গেলেন মহান শহীদ। পাকিস্তানে আওয়াজ উঠল- আরে কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ! পাকিস্তানের জন্মদাতা বাপ জিন্নাকে কাফের হিন্দুরা তো নরঘাতক রাক্ষস মনে করে। আর দেখ, আমাদের জস্‌সু ভাইয়া কায়েদ্-এ- আজম্‌কে সম্মান, স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়েছে। ভারত ভাগের জন্য কায়েদ-এ-আজম্‌কে দায়ী করেনি। ভারতে বইটার দাম ৬৫০ টাকা, পাকিস্তানে ১৫০০ টাকা (পাকিস্তানী)। ইসলামাবাদ ও করাচীতে হু হু করে পেঙ্গুইনের (বইটার প্রকাশক) দোকান থেকে বইটা বিক্রি হতে লাগল। পুস্তক ব্যবসায়ীরা বলল, গত ৩০ বছরে কোন বইয়ের এরকম বিক্রি হয়নি। যশোবন্ত সিংকে তারা আমন্ত্রণ করল সম্বর্ধনা ও 'বুক সাইনিং সেশন'-এর জন্য। প্রকাশক বলল, কোন রকমে ৫০০ বই বাঁচিয়ে রেখেছে বুক সাইনিং সেশন- এর জন্য, যশোবন্ত দোকানে বসে নিজে হাতে স্বাক্ষর করে ক্রেতাদের হাতে তুলে দেবেন। ইসলামাবাদে প্রকাশকের কথায়—মুহূর্তের মধ্যে সব বই বিক্রি হয়ে যাবে। আরও বইয়ের জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানে জস্‌সু ভাইয়ার উদ্দেশ্য কাওয়ালি গান লেখা হয়ে গেল। বিখ্যাত কাওয়ালি গায়ক বাঁকে মিয়াঁর গলায় পাকি স্তান টিভিতে সেই কাওয়ালির সম্প্রচার হচ্ছে-"কোই তো হ্যায় যো ওঁহা হামারে তরানে গা রহা হ্যায়, হামারে বাদোঁ কো ওঁহা ইয়াদ কিয়া যা রহা হ্যায়, নাম হ্যায় উস্‌কা যশোবন্ত সিং, আউর ফ্যান হ্যায় ওহ্ কায়েদ্-এ-আজমকা। তো জস্‌সু ভাইয়া, আপ তো অব জরা বাঁকে মিয়া কি আকে কাওয়ালি সুন্ লে, আউর আপ্‌নে আপ্‌নে নাম কি ২১ গাঁনো(বন্দুক) কি সালামি সুন্ লে"। মনে হচ্ছে এরপর যশোবন্ত পাকিস্তানে ভোটে দাঁড়ালে জারদারি-গিলানিরা হেরে ভূত হয়ে যাবে।

সকলের মনেই প্রশ্ন উঠবে, হঠাৎ যশোবন্তের এই জিন্না প্রেম কেন? এটা রক্তধারা নাকি অন্য কোন কারণ বলা কঠিন। কিন্তু, জিন্না সেকুলার ছিল, ইতিহাস পুরুষ ছিল--- এ কথা তো আদবানিও বলেছেন। তিনি পাকিস্তানে গিয়ে কায়েদ্- এ-আজম্ সংগ্রশালা পরিদর্শন করে সেখানে মন্তব্যের খাতায় একথা লিখে দিয়ে এসেছেন। এবং আজও সে বক্তব্য তিনি প্রত্যাহার করেন নি। আর. এস. এসের প্রাক্তন সরকার্যবাহ এচ. ভি. শেষাদ্রিও তাঁর 'ট্র্যাজিক স্টোরি অব পার্টিশান' বইতে দেশভাগের জন্য জিন্নাকেই একমাত্র দায়ী করেননি। তিনিও গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল ও বৃটিশকে দায়ী করেছেন।

তাহলে সত্যটা কি? দেশভাগের জন্য জিন্না দায়ী, না দায়ী নয়? গান্ধী নেহেরু, প্যাটেল-এরাই কি দেশভাগের জন্য দায়ী? নাকি এরা সবাই আংশিক দায়ী? শুধুই বৃটিশ দায়ী? জিন্না কি সত্যি সেকুলার ছিল? গান্ধীর অবহেলা (১৯২০ সালে অসহযোগ ও খিলাফতে গান্ধী আধুনিক মনস্ক জিন্নাকে গুরুত্ব না দিয়ে কাঠমোল্লা মৌলানা মহম্মদ আলি ও সৌকত আলিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন) এবং নেহেরু-প্যাটেলদের ক্ষমতালিপ্সাই কি আধুনিক প্রগতিশীল জিন্নাকে ইসলামিক মৌলবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছিল? এই প্রশ্নগুলি যশোবন্তের ওই বইটিকে উপলক্ষ্য করে নতুন করে উঠে এল। এটা ভাল হল। এ জন্য যশোবন্তকে ধন্যবাদ।

এখন এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা যাক। বিখ্যাত পাকিস্তানী ঐতিহাসিক আয়েষা জালাল, যিনি বর্তমানে আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, এতবড় একটা দেশকে মাত্র একটা মানুষ ভেঙে দিল-এটা কি সম্ভব? সঠিক প্রশ্ন। এতবড় দেশকে জিন্না একা ভাঙতে পারে না। তাহলে বৃটিশ ভেঙে দিল! হ্যাঁ, নিশ্চয় বৃটিশ ভেঙে দিল। কিন্তু ভাঙতে পারল কি করে? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত আছে আধুনিক ব্যারিস্টার জিন্নার ভারতঘাতক জিন্নাতে রূপান্তরের রহস্য। এ কথা ঠিক যে জিন্না সেকুলার থাক বা না থাক, কিন্তু কাঠমোল্লা ছিল না। আদবানি যশোবন্তরা জিন্নাকে সেকুলার বললেন। সেকথা যদি মেনেও নেওয়া যায়, তবু এটা হল অর্ধসত্য। আর অর্ধসত্য হল মিথ্যার থেকেও ভয়ংকর, ক্ষতিকর! তাহলে পুরো সত্যটা কি? যেহেতু আমার কোন রাজনৈতিক স্বার্থ নেই, তাই পুরো সত্যটা আমি পাঠকের সামনে তুলে ধরছি।

সত্য হল এই—জিন্না পাকিস্তান তৈরী করেনি, পাকিস্তান জিন্নাকে তৈরী করেছে। জিন্না ভারত ভাঙেনি। ইসলাম ভারতকে ভেঙেছে। জিন্নার নিজের কথায়, 'যেদিন ভারতে প্রথম ব্যক্তিটি ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে, সেদিনই ভারতে পাকিস্তানের বীজ পোঁতা হয়েছে।' জিন্নার নিজের কথায় (যখন কংগ্রেস পাকিস্তানের দাবী মানে নি) 'একটা চিতাবাঘের ছানাকে বন থেকে তুলে আনা যায়, কিন্তু তার মন থেকে বনকে মুছে ফেলা যায় না। তোমরা (কংগ্রেস বা হিন্দুরা) আজ পাকিস্তানের দাবী অস্বীকার করছ, কিন্তু ভারতে প্রতিটি মুসলমানের মনে যে পাকিস্তান আছে, তাকে তোমরা মুছে ফেলতে পারবে না।' **[ সূত্র ঃ-মিনিং অফ্ পাকিস্তান, লেখক-এফ এ. খান দুরানী ]**

অর্থাৎ, ভারতে প্রতিটি মুসলমানের মনে পাকিস্তানের স্বপ্ন ছিল, বাসনা ছিল, কামনা ছিল। সেই স্বপ্ন, বাসনা, কামনা জিন্না তৈরী করেনি। তা তৈরী করেছে ইসলাম। প্রতিটি মুসলমানকে ছোটবেলা থেকে দারুল ইসলামের স্বপ্ন দেখিয়েছে। সমগ্র বিশ্বে দারুল ইসলাম (ইসলামের রাজত্ব, শরীয়তের শাসন) স্থাপন করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, পবিত্র কর্তব্য-এটা শিখিয়েছে। ইসলামের এই মূল শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতের ইতিহাস। এদেশে মুসলমান নবাব বাদশারা সাড়ে পাঁচশ (১১৯২-১৭৫৭) বছর রাজত্ব করেছে। তারপর ইংরেজরা এসে ছলে বলে কৌশলে দেশটা দখল করেছে। সুতরাং এটা ওদের (মুসলমানদের) পূর্বপুরুষের অর্জিত সম্পত্তি। তাই ওরাই এর ন্যায্য দাবীদার। 'পাকিস্তান' শব্দটা তো বেশী পুরনো নয়। ৩০-এর দশকে রহমৎ আলি লন্ডনে বসে এই শব্দটা তৈরী করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা ভারতের সব মুসলমানের মনে ধরে গেল। কি করে গেল? পাক্-ই-স্তান(উর্দু শব্দ) মানে পবিত্র স্থান। তাহলে কি ভারতটা ওদের কাছে পবিত্র নয়? যে মাটিতে ওদের পিতৃ-পিতামহের জন্ম, যে মাটির অন্ন জলে ওদের শরীরের রক্ত মাংস তৈরী হয়েছে, যে মাটিতে ওরা ভূমিষ্ঠ হয়েছে-সে মাটি ওদের কাছে প্রিয় নয়, পবিত্র নয়? তাহলে কি এটা ওদের কাছে অপবিত্র? তাই একটা আলাদা করে করে পবিত্র স্থান চাই? হ্যাঁ, এটাই ঠিক। ওরা তাই চায়। তাই তো 'পাকিস্তান' শব্দটা পাওয়া মাত্র ওরা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করল।

এই যে জন্মস্থানকে শ্রদ্ধা না করা, জন্মভুমির প্রতি আনুগত্য না রাখা-ওদেরকে কে শিখিয়েছে? জিন্না? না, জিন্না নয়। এ শিক্ষা ওদেরকে দিয়েছে ইসলাম। শুধু ভারতে নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানকে এই শিক্ষা আজও দিয়ে চলেছে ইসলাম। তাই চেচ্‌নিয়া ও ও জিন্‌জিয়াং রাশিয়া ও চীনের শাসকদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ওখানে জিন্না নেই।

অর্থাৎ, পাকিস্তান তৈরীর জন্য মুসলমানদের মনে উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই ছিল। সেই ক্ষেত্রে গান্ধী নেহেরু সুরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনরা দেশপ্রেম দেশভক্তির চাষ করার অনেক চেষ্টা করেছেন। তাঁদের চেষ্টার আন্তরিকতার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু ওই ক্ষেত্রে ও ফসল ফলেনি। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনে, কি অহিংস কি সহিংস, বাংলায় ৫৪ শতাংশ জনসংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও একজনও মুসলমান শহীদ হয়নি। শত শত শহীদ হয়েছে যুক্ত বাংলার সংখ্যালঘু ৪৬ শতাংশ হিন্দুদের মধ্য থেকেই।

জিন্না প্রথমে কংগ্রেসে ছিল। আধুনিক প্রগতিশীল ছিল। কিন্তু সে দেখল, গান্ধী নেহেরু প্যাটেল থাকতে কংগ্রেসে সে বড় নেতা হতে পারবে না। আর আধুনিক হয়ে, দেশপ্রেমিক হয়ে, জাতীয়তাবাদী হয়ে মুসলমানদের মধ্যে কস্কে পাওয়া যাবে না। তার পিছনে মুসলমানরা আসবে না। কারণ, মুসলিম মনে দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদের চাষ করলে ফসল ফলে না। ওই মনে কোন্ চাষ করলে ফসল ফলে? কোন্ চাষের জন্য ওই জমিন উর্বর? সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের চাষের জন্য ওই জমি সম্পূর্ণ উর্বর। ওই চাষ করলে ফসল ফলবে সোনা। সেই সোনা ফসলের জন্য জিন্না প্রলুব্ধ হল।

অর্থাৎ জিন্না পাকিস্তান তৈরী জন্য উর্বর জমি তৈরী করেনি। পাকিস্তানের জন্য তৈরী হয়ে থাকা জমির উর্বরতাই জিন্নাকে প্রলুব্ধ করে টেনে নিয়ে গেল। ঐ উর্বর জমির লোভ কংগ্রেসী আধুনিক জিন্নাকে পাকিস্তান-আন্দোলনের নেতা সাম্প্রদায়িক জিন্নাতে পরিণত করল।

সুতরাং জিন্না একা ভারতকে ভাগ করেনি। ইসলাম ভারতকে ভাগ করেছে। ইসলামের ধারক ভারতের প্রতিটি মুসলমান ভারতকে ভাগ করেছে।

মুসলমানের পয়সা খাওয়া ঐতিহাসিক আর ভোটলোভী রাজনৈতিক নেতারা সত্যটাকে গুলিয়ে দিতে চায়। দুটো তথ্য এরা বলে না। (১) স্বাধীনতার আগে ১৯৪৬ সালে গোড়ায় অখন্ড ভারতে নির্বাচন হয়েছিল। ইস্যু ছিল একটাই। কংগ্রেসের দাবী অখন্ড ভারত, মুসলিম লীগের দাবী ভারত ভাগ করে পাকিস্তান। সেই নির্বাচনে সারা দেশের ৯২ শতাংশ মুসলমান ভারত ভাগের পক্ষে মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছিল। অর্থাৎ, দেশ ভাগ—জিন্নার একার দাবী ছিল না। দেশের সমস্ত মুসলমানের দাবী ছিল। সুতরাং দেশভাগের জন্য জিন্না একা নয়, সমস্ত মুসলমানরা দায়ী-এটা ঐতিহাসিক সত্য। (২) ভারতের যে অংশ পাকিস্তান হওয়ার কথা নয়, অর্থাৎ, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র-এ সমস্ত জায়গায় মুসলমানরাও পাকিস্তানের পক্ষে, দেশভাগের পক্ষে ভোট দিয়েছিল? কেন? তারা কি পাবে এতে? তাদের কি স্বার্থ? তাহলে পাকিস্তানের দাবী, পাকিস্তানের চাহিদা শুধু পাঞ্জাব, সিন্ধ, বাংলার মুসলমানের নয়! এ চাহিদা ভারতের সকল মুসলমানের। অর্থাৎ ইসলামের। তাই দেশভাগের জন্য শুধু জিন্না, সলিমুল্লা, সুরাবর্দী, মুজিবর রহমানেরা দায়ী নয়; সুদুর কেরল, মাদ্রাজের অতি সাধারণ মুসলমানও এর জন্য দায়ী। ঐ নির্বাচনের পরেই জিন্না আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এবং যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলেছিল, 'আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করে দিলাম, পাকিস্তানের দাবী ভারতের কতিপয় মুসলমানের দাবী নয়। এ দাবী সমগ্র ভারতের

*শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়*

# মগরাহাটে ২৫ বছরের দুর্গাপূজা বন্ধ হওয়ার মুখে

দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলার মগরাহাট থানার হোটর গ্রামে 'দক্ষিণ মর্যাদা সার্বজনীন দুর্গাপূজা' গত ২৫ বছরের। সেই দুর্গাপূজা এবার মুসলিমদের বাধায় বন্ধ হওয়ার মুখে। ঐ গ্রামে ২ শতক জায়গার উপর শোভারানী এ্যাথলেটিক ক্লাব আছে। তার পাশে ৩ শতক জায়গার উপরে দেবীর থানে ঐ সার্বজনীন দুর্গাপূজা হয়। তার পাশে মুসলিমদের কবরস্থান আছে। মুসলিমরা দাবী করে, ঐ দেবীমাতার থান ও ক্লাবঘরের জায়গা করবস্থানের মালিকানা।

এই নিয়ে তারা এর আগে বি. ডি.ওর কাছে দরখাস্ত করেছিল। বি. ডি.ও, এবং বি. এল. আর.ও এসে হিন্দুদের জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে ও মাপজোপ করে বলে যান যে ও দুটো কবরস্থানের জায়গা নয়, হিন্দুদেরই জায়গা। এবছরও মুসলিমরা দুর্গাপূজা বন্ধ করার জন্য ১৪৪ধারা জারীর আবেদন করে। মহকুমা আদালতে কেস করেছে। কেসের পরবর্তী তারিখ পড়েছে ৬ অক্টোবর, অর্থাৎ দুর্গাপূজার অনেক পরে। তবুও মুসলিমরা গায়ের জোরে ঐ পূজা বন্ধ করতে চাইছে। মগরাহাট থানার পুলিশ পঙ্গু।

গত ৪ সেপ্টেম্বর ২ জন হিন্দু ছেলে দুপুরবেলা ক্লাবে বসে আলোচনা করছিল, আর দুঃখ করছিল যে, হিন্দুদের ২৫ বছরের পূজোটা বন্ধ হয়ে যাবে! পাশের রাস্তা দিয়ে চারজন মুসলিম মহিলা যাচ্ছিল। তারা পাশেই মুসলিম পাড়ায় মসজিদে গিয়ে বলে যে ক্লাবে হিন্দুরা বলছে ওরা দুর্গাপূজা করবে। এই মসজিদটি মাত্র ৪-৫ বছর তৈরী হয়েছে। এই মুসলিম পাড়ায় ২৫ ঘর মুসলিমের বাস। একথা শুনে প্রায় ৪০-৪৫ জন মুসলমান সঙ্গে সঙ্গে এসে ঐ ক্লাবে চড়াও হয় ও হিন্দু ছেলে দুটিকে মারতে থাকে এবং ক্লাব ঘরটি ভেঙ্গে দেয়। তখন অন্য হিন্দুরা বেরিয়ে এলে সংঘর্ষ বেধে যায়। কিছুটা দূরের বড় মুসলিম পাড়া উত্তর মুকুন্দপুর থেকেও মুসলমানরা চলে আসে। দুপক্ষে প্রচন্ড মারপিট হয়। সংঘর্ষে ১২ জন হিন্দু ও ৫ জন মুসলিম আহত হয়। পুলিশ ও র‍্যাফ আসে। হিন্দুদের আঘাত গুরুতর। ৪ জন আহত হিন্দুকে পুলিশ হাসপাতালে পাঠায়। হিন্দুদের পক্ষ থেকে হামলাকারীদের নাম দিয়ে ডায়েরীও করা হয়। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে পশ্চিমবঙ্গের পঙ্গু পুলিশ কোন মুসলিম হামলাকারীকে গ্রেফতার করার সাহস দেখাতে পারবে না।

আহতদের মধ্যে আছেন শ্রীমতি রেখা নস্কর (৪৫)-মুখে অস্ত্র দিয়ে আঘাত। শ্রীমতি শান্তি মণ্ডল (৪২)- বাঁশ দিয়ে পায়ে আঘাত। শ্রী অরূপ মণ্ডলকে (২৫) প্রচন্ড মেরেছে, কানের গোড়া ফেটে গিয়েছে। বিশ্বরূপ মণ্ডলকে (২৪) মেরেছে, তার পিঠে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। দেবাশীষ মণ্ডল (২৮) প্রচন্ড মার খেয়েছে। আক্রমণে নেতৃত্ব দেয় স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী খলিল শেখ। এছাড়াও ছিল ওলামিন শেখ, আমিন, অজিত শেখ, গুট্টু, গব্‌লেট, আজিত ও অন্যান্যরা। ঐ শোভারাণী ক্লাবের সদস্যরা ও অন্যান্য হিন্দু যারা মার খেয়েছে তারাও তৃণমূল কংগ্রেস করে। সেই জন্য তারা মার খেয়ে স্থানীয় তৃণমূল অঞ্চলপ্রধান শ্রীমতি স্বপ্না হাজরার কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে তিনি নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন ও বলেন এ বিষয়ে তিনি কিছু করতে পারবেন না।

সমগ্র দক্ষিণ ২৪পরগনা জেলায় অনেক দুর্গাপূজা আজ বন্ধ হওয়ার মুখে। সি পি এমের অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। আর তৃণমূলের উৎসাহে মুসলিমরা হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করার কাজে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। স্কুলে স্কুলে সরস্বতী পূজা বন্ধ করা ও নমাজ পড়ার দাবীতে তারা হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে। সুতরাং হিন্দুর অবস্থা—উত্তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত চুল্লীতে পড়ার মত। তৃণমূল বাড়বে দুর্গাপূজা কমবে। তারপর হিন্দু স্থানচ্যুত হবে। দেওয়ালের এই লিখন বাঙালি হিন্দু পড়তে পারছে কি?

তৃতীয় পাতার শেষাংশ

## জিন্না যশোবন্ত .....

সমস্ত মুসলমানের দাবী। আমরা আরও প্রমাণ করে দিলাম যে কংগ্রেস ও গান্ধী ভারতের মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করেনা। ভারতের আপামর মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধি মুসলীম লীগ'। এই ঐতিহাসিক সত্য যতদিন আমরা স্বীকার না করব, ততদিন ভারতের জাতীয় সংহতি মজবুত ভিত্তির উপরে স্থাপিত হবে না। ততদিন ভারতে অসংখ্য ছোট বড় কাশ্মীর তৈরী হবে। ততদিন ভারতমাতার অঙ্গ থেকে রক্ত ঝরবে। ততদিন আমরা সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত হব না।

কেরল মাদ্রাজ মহারাষ্ট্র বিহার আসাম পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদেরকে জিজ্ঞাসা করতেই হবে—সেদিন কেন তোমরা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিলে? যদি পাকিস্তান তোমাদের এতই কাম্য ছিল, তাহলে তোমরা পাকিস্তানে চলে গেলে না কেন? আজ কি তোমরা মনে কর যে সেদিন তোমরা ভুল করেছিলে? তাহলে তোমাদের মুখে আজও সেকথা শোনা যায় না কেন? তোমাদের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতৃত্ব আজও সে কথা বলে না কেন? আজও তোমাদের ভারতমাতা বা বন্দে মাতরম্ বলতে দ্বিধা কেন? আজও কেন খেলায় পাকিস্তান জিতলে অনেক মুসলিম এলাকায় বাজি ফাটে? আজও কেন আসামে, কাশ্মীরে ও অনেক জায়গায় পাকিস্তানের পতাকা ওড়ে?

যদি তোমাদের ১৯৪৬ সালে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক হয়, তাহলে তোমাদের তো পাকিস্তানে চলে যাওয়া উচিত। আর যদি তোমরা মনে কর যে সেদিন তোমরা ভুল করেছিলে, তাহলে সেই ভুলের পরিণামে পাকিস্তানে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নিহত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ হিন্দুনারী ধর্ষিতা হয়েছে, কোটি কোটি হিন্দু সর্বস্ব খুইয়ে রিফিউজী হয়েছে—তাদের কাছে তোমাদের নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া উচিত। এবং তোমাদের সমাজে গণভোট করে সেদিনকার ভুল স্বীকার করা উচিত। তা না হলে প্রতিটি ভারতবাসী মনে করবে যে তোমরা সুযোগ পেলেই আবার ভারতকে ভাঙবে, আবার পাকিস্তান তৈরী করবে।

সুতরাং ঐতিহাসিক সত্য হল যে, জিন্না পাকিস্তান তৈরী করেনি। ইসলাম পাকিস্তান তৈরী করেছে। ইসলামের প্রতিনিধি হয়ে ভারত ভাঙার ভূমিকা পালন করেছে সারা ভারতের ৯২ শতাংশ মুসলমান, একা জিন্না নয়। জিন্না শুধু সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে। ভারতের মুসলমানের মনে বিচ্ছিন্নতাবাদের যে উর্বর জমি প্রস্তুত হয়ে ছিল, জিন্না তাতে সাম্প্রদায়িকতার চাষ করে পাকিস্তানের ফসল ফলিয়েছে। আদবানি যশোবন্তরা যদি জিন্না প্রশস্তি গাইতে গিয়ে অর্ধেক সত্য না বলে পুরো সত্যটা বলতেন, তাহলে তাঁদের কাছে দেশ ও জাতি কৃতজ্ঞ থাকত। কিন্তু ভারতের রাজনীতিবিদদের কাছে সত্য বা পূর্ণ সত্য আশা করা যায় না। তাহলে দেশটা এই দুর্দশা হ'ত না।

## গোমাংস বিক্রি নিয়ে পিঁয়াজগঞ্জে গন্ডগোল

আগেই মন্দিরের কাছে অবৈধ মসজিদ নির্মাণ নিয়ে সংহতির খবরে উঠে এসেছে পিঁয়াজগঞ্জ। হাইকোর্টের রায়কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে পুলিশি সহায়তায় ঐ মসজিদটির নির্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ, যদিও হাইকোর্টে কেস চলছে। এলাকায় নিয়মিত পুলিশ পোস্টিং থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী ও প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান গিয়াসউদ্দিনের প্ররোচনায় এলাকায় শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। তবুও হিন্দুরা প্রতিরোধ করছে। গত ২৩শে আগস্ট পিঁয়াজগঞ্জের হিন্দুপাড়ার মধ্য দিয়ে সাইকেল ভ্যান করে গোমাংস নিয়ে অন্য পাড়ায় বিক্রি করতে যাওয়ার বদ মতলবে বাধা দেয় স্থানীয় প্রতিবাদী হিন্দু যুবক ও মহিলারা। ধূর্ত ঐ গোমাংস বিক্রেতা মহিলা ভ্যান ফেলে পাশের মোল্লাপাড়া থেকে সমাজবিরোধীদের ডেকে আনে। নির্বিচারে শুরু হয় বোমাবাজি ও হিন্দু ঘরদোর ভাঙচুর। হিন্দুরা পাল্টা জবাব দেয়। হিন্দু প্রতিরোধে সমাজবিরোধীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ৬ জন হিন্দু ও ৩ জন মুসলিমকে উস্থি থানায় ধরে নিয়ে যায়। বিশিষ্ট হিন্দু আইনজীবি তপন বিশ্বাস খবর পেয়েই উস্থি থানায় যান এবং ও.সি-র সঙ্গে কথা বলেন। জানা গিয়েছে পরে পুলিশ তিনজন হিন্দুকে ছেড়ে দেয়। থানায় উভয় পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে ৬ জন হিন্দু ও ১১ জন মুসলিমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

## ডিহি কলসে দেবোত্তর সম্পত্তিতে মুসলিম জবর দখল

মগরাহাট থানার ডিহি কলস গ্রামের ৮০ বছরের প্রাচীন শিবমন্দিরের জায়গা জমি জবরদখল করে নিচ্ছে ঐ জমির লাগোয়া মুসলিম বাসিন্দারা। সরকারি রেকর্ডে ডিহি কলস, জে এল নং ১১২, খতিয়ান নং ৯৬৫, তৌক্তি ১৫৫ অন্তর্গত ২৩ শতক দেবোত্তর সম্পত্তির উপরে এই প্রাচীন শিবমন্দির স্থানীয় হিন্দুদের (বর্তমানে সংখ্যালঘু) দ্বারা পূজিত হয়ে আসছে। বর্তমানে ঐ মন্দিরের ২৩ শতক জমির প্রান্তগুলি মুসলিমদের দ্বারা দখল হয়ে যাওয়া ও ঐ জমিতে অপরিচ্ছন্নভাবে খড়ের গাদা, জ্বালানি, ছাগল মুরগি বেঁধে রাখা, মাটি কেটে নেওয়া, জোরপূর্বক অপ্রয়োজনীয় রাস্তা তৈরী করা, ইত্যাদি কারণে স্থানীয় হিন্দুরা কোন ধার্মিক কাজ করতে পারছে না। জমির দখল নিয়ে স্থানীয় ডায়মন্ডহারবার কোর্টে মামলা রয়েছে। তবুও হিন্দুরা রেকর্ডভুক্ত এই দেবোত্তর সম্পত্তির দখল হারাচ্ছেন। মামলার পরিচালক স্থানীয় মধুসূদন নস্কর জানালেন, হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তি দখল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন কর্তাদের জানিয়েও কোন ফল হয়নি। আদালতের কাজের দীর্ঘসূত্রিতার জন্য হিন্দুরা তাদের ধার্মিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তিনি আরো জানান, কয়েক বছর পূর্বে মন্দির থেকে অনেক কষ্টে পুলিশি সহায়তায় উদ্ধার হওয়া শিবলিঙ্গের পবিত্রতা রক্ষার জন্য নিজ বাড়ীতে তা রাখতে বাধ্য হন।

সংবাদে প্রকাশ, দেবোত্তর সম্পত্তির উপরে জবর দখলিকার অন্যতম দুস্কৃতি হান্নান গাজী ঐ জায়গার উপর দিয়ে অবৈধ রাস্তা পাবার জন্য ডায়মন্ড হারবার ফৌজদারি কোর্টে মামলা দায়ের করেছে। আর তার ফলেই নাকি হারিয়ে যাচ্ছে হিন্দুদের দায়ের করা মামলার কাগজ আর দেবোত্তর সম্পত্তির নথিপত্র। আরো জানা গেছে মগরাহাট ব্লকে ১৯৮১ সালের ৮৭ শতাংশের সংখ্যাগুরু হিন্দুরা আজ ৪৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আর মগরাহাটের সবত্রই চলছে এই ভাবে হিন্দুর জমি ও দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের চক্রান্ত।

## আমাদের ইমরানারা কবে লুব্‌না হবে?

ইসলামিক রাষ্ট্র সুদানে শরীয়ত আইনে বিচার চলছে রাষ্ট্রপুঞ্জের হয়ে কাজ করা মহিলা সাংবাদিক লুব্‌না আহমেদের। তাঁর অপরাধ, কয়েকজন বন্ধুর সাথে তিনি 'আপত্তিকর পোশাক' পরে রেস্তোঁরায় বসেছিলেন। আপত্তিকর পোশাকটি কি? ট্রাউজার্স। সাজা হল চল্লিশ ঘা বেত। অন্য যারা লুবনার সাথে ছিলেন তাঁরা বেতের ঘা খেয়ে ছাড়া পেলেন। কিন্তু লুব্‌না এই সাজায় রাজী না হওয়ায় তাঁর বিচার চলছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ ব্যবস্থা অনুযায়ী লুবনা এই বিচার থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কিন্তু লুবনা সে সুযোগ নিতে রাজী নন। তাঁর বক্তব্য—শরীয়ত আইন অনুযায়ী তিনি কোন অন্যায় করেন নি। বরং শাস্তিটাই অন্যায়। তাই এই আইনের বদলের জন্য তাঁর লড়াই। প্রশ্ন জাগে, ভারতে কি লুবনারা নেই?

ভারতের ইমরানারা শরীয়তের ফতোয়া মেনে আর কতদিন শ্বশুরের বিছানায় শুতে বাধ্য হবে? ভারতের ইমরানারা কবে লুব্‌না হবে?

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে
ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http://hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffmail.com